শব্দশিল্পী রমেন্দ্রকুমার

সুমিতা চক্রবর্তী

ঙাপ্পি। এই শব্দটি বাংলা কবিতায় আগে একবার পেয়েছি। সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' কবিতায়। ---"বর্মার ঙাপ্পিতে ব াপরে কি গন্ধ।" বর্মা-র এই বিশিষ্ট খাদ্যবস্তুটির উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু বঙ্গীয় রসনায় তাকে স্বাদু বলে ভাবতে পারেননি কবি সুকুমার। রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী 'ঙাপ্পি' নামে একটি সম্পূর্ণ কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি সম্পরঁই উদ্ধার করা য াক ---

চি নিয়ে ঝগড়া চলে না।
তুমি ঙাপ্পি খেয়েছো? গন্ধের উথাল।
জানি বমি করে দাও---তবু যারা জানে
তারা খায় তারিয়ে তারিয়ে---
বলে অপূর্ব সুতার। আহা, হেরে যায় দর্পবান্ তাম্বাচূড়া,
ঝলমলে জিওল সেও হেঁটমুণ্ড থাকে,
এর কাছে হতমান খাদ্যের ভারতী তন্দুরি;
এমন স্নিয় নেই আশর্চ্য য়োরোপে
যেখানে ফরাস আজও ভোজনবিলাসে রাজা,
আরবের খলিফারা এর স্বাদ ঝাঁঝ পেলে নাচতেন তাধিন্
কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর কাব্য? এই ঙাপ্পি?
বর্মীদের প্রিয়? না শ্রুতকীর্তি রোমাণ্টিক গোলাপ?

খুবই সরল বক্তব্যময় কবিতা। অর্থ--প্রত্যেকেরই নিজস্ব চি আছে এবং চিভেদ আছে। প্রত্যেকের কাছেই তার নিজস্ব চি--চির উপকরণটি অতুলনীয় উপভোগ্য। যদি বলা যায় রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী-র কবিতা সম্ভার এক সমৃদ্ধ ও মননশীল ইন্দ্রিয়বেদিতার সূক্ষ্ম-স্থাপত্য তাহলে তাঁর রচনা-কর্মকে বোঝা যায় কিছুটা। মননশীল ইন্দ্রিয়বেদিতার প্রকৃত অধিকারী কম মানুষই হতে পারেন। এই ইন্দ্রিয়বেদিতার অর্থ মোহিতলালের ভোগবাদ নয়। নরনারীর কামমোহিত ঘনিষ্ঠতার স্থান থ াকলেও তা প্রধান নয় এই নির্মাণলোকে। এই জগতের মাধ্যকর্ষণ ভোগ নয়, উপভোগ। সেই উপভোগের পঞ্চ-দুয়ার সেই পাঁচ ইন্দ্রিয়ই--দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ এবং পাঁচের কেন্দ্রে সু-কর্ষিত এক উপভোক্তার মন। সে মন লোভী নয়, রসিক। সে-মন উদর পূর্তির জন্য অনেক খাদ্য চায় না। সে মন পৃথক পৃথক ভাবে স্বাদ গ্রহণ করতে চায়--কখনো কয়েকশে া বছরের পরীক্ষা ও গবেষণার পর প্রায় 'পারফেক্শন'-এ পৌঁছানো পুরোনো ফরাসি মদের স্বাদ কখনো মোটা রাঙা গরম ভাত আর চাষির আঙিনায় ফলানো টাটকা সবজির।

যাঁরা চি-বিলাসী হন এবং যাঁদের চি হয় মননস্নাত---সাধারণতই তাঁরা চি-স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান শুধু নয়, সমাদার করতে জ ানেন। তাই বিচিত্রের সমাবেশ ঘটে তাঁদের শিল্পভুবনে ও শিল্প ভাষায়। পার্থিব কোনো কিছুই বর্জিত হয় না তাঁদের আস্ব াদন ও মননের জগৎ থেকে। জানবার জগৎকে তাঁরা ক্রমেই বিস্তৃত করতে চান বলে পঠন ও বৈদগ্ধ্যের চিহ্নগুলি শিল্পিত হয়ে ওঠে তাঁদের কলাকৃতিতে। রমেন্দ্রকুমার একটি কাজ করেছেন তাঁর কবিতার সংকলন করতে গিয়ে, তিনি তাঁর কবিত

ায় ব্যবহৃত কোনো কোনো শব্দ ও বাক্যবন্ধের অর্থ নির্ণয় করে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন সংকলনের শেষে। বাঙালি কবিরা এই কাজটি সাধারণত করেন না। বহু দুহ শব্দাবলীর ব্যবহার সত্ত্বেও জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সেরকম কোনো প্রয়াস করেননি। অনেক পরে সতর্ক পাঠকেরা অনেক সময়ে তাঁদের কবিতার শব্দার্থ-তালিকা প্রণয়ন করেছেন কিছু কিছু।

রমেন্দ্রকুমার প্রদত্ত এই শব্দার্থ সূত্র থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বহু শব্দ কবিতায় ব্যবহার করেন যা সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের কাছে অজানা হবার সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় অবহিত। কিন্তু কবিতার ভাষাকে সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের কাছে সুবোধ্য ও সরল করে তোলার আগ্রহ তাঁর নেই। কবিতার জন্য থাকবেন বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন, বিশেষ শিক্ষা-সম্পন্ন স্বতন্ত্র এক পাঠক সমাজ-- এই অভিমত খুবই সুপ্রচল ছিল ফরাসি সিম্বলিস্ট কবিদের মধ্যে। যে দুই ইংরেজি লিখিয়ে কবি আধুনিক বাঙালি কবিদের আধুনিকতার দীক্ষায় প্রায় গুর প্রায় গুত্ব ভূমিকায় বৃত ছিলেন সেই এলিয়ট ও পাউণ্ড ছিলেন ব্যাপক অধ্যয়ন এবং বৈদগ্ধ্য-শীলিত কাব্য ভাষার পক্ষপাতী। সাধারণ-পাঠক মুখাপেক্ষী সারল্যের সমর্থক তঁারা একবারেই ছিলেন না। তাঁরা নিজেদের কবিতার দুহ অনুষঙ্গসমূহের সন্ধান-সূত্র কিছু কিছু নিজেরাও দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য কবিতা আলোচকেরা যত্নের সঙ্গে এই কবিদের দুহ কাব্যসমূহের সম্পূর্ণ টীকা প্রস্তুত করেছেন।

পশ্চিমী কবিদের এই রচনা-পদ্ধতি বিশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দশকে ইংল্যাণ্ডের প্রধান কবিদের লেখায় গৃহীত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে তিনজন--জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে --- নিজের নিজের ধরনে এই দুরূহের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের কবিতায় --সুধীন্দ্রনাথের ভাষায়-- 'উদ্ধারসঙ্কুল রচনারীতী'-তে পারদর্শী ছিলেন তাঁরা। পরবর্তীকালে কিন্তু বাংলা কবিতায় এই রীতি প্রায় ত্যক্ত হয়েছিল বেশ কিছুকালের জন্য। চারের দশকের সমাজ মনস্ক ও রাজনীতিবোধ-সচেতন কবিরা সরলতর ভাষার ও জনসাধারণের ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন; পাঁচের দশকের 'আত্মমগ্ন' লিরিক কবিতার রচয়িতারাও শাব্দিক দুহতা বা অধ্যয়নজাত মনন-নির্ভর অনুষঙ্গ কিছুটা যেন এড়িয়েই চলেছিলেন। চার ও পাঁচের দশকের কবিতার প্রধান ধারার পাশে বিপরীত ধারাও ছিল। ছিলেন অশোকবিজয় রাহা, অণকুমার সরকার, অণ ভট্টাচার্য, জগদীশ, নরেশ গুহ। পরবর্তী দশকেও সমাজ রাজনীতি মনস্ক কবিতা রচিত হয়েছিল যথেষ্ট। পাঁচের দশকে এই ধারার নতুন কবিও এসেছিলেন --তণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত; সেই সময়ের পূর্ণেন্দু পত্রী---তেভাগার আন্দোলনের স্মরণে কবিতা লিখেছিলেন। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত লিখেছিলেন 'বুধাখালি' নিয়ে। কিন্তু কবিতার ত্রিলোকব্যাপ্ত পরিসরে 'ব্রহ্ম' আর 'পুঁতির মউরি'- কে মেলাবার সাধনা করেননি কেউই। সেই সাধনাটাকেই কবিতা করে তোলবার বাসনাও ছিল না কারোর। সেই সাধণার যোগ্য কবিভাষার অবশ্যম্ভাবী দুহতাল তাস দেখা যায় না অন্য কোনো কবির লেখায়। --এসবের মধ্যে বোধহয় তখন একমাত্রই ব্যতিত্রম ছিলেন রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী। চল্লিশের দশকের শেষ থেকে শু করে আশি-র দশক পর্যন্তই কবিতা লিখেছেন তিনি--অজস্র ধারায় না হলেও স্রোতের বহতা থেমে যায়নি কখনো। কিন্তু আজ পর্যন্তও তিনি তাঁর সেই ব্যতি ত্রমী অবস্থান বজায় রেখেছেন। ব্যতিত্রম হবার অসুবিধেও সম্ভবত তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে কিছুটা। তাঁর একক যাত্রা সরল টানে কোনো গোষ্ঠীতে গিয়ে শেষ হয়নি। গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের যুক্ত হবার সুবিধেটাও তাই তেমন পাননি তিনি।

রমেন্দ্রকুমার প্রদত্ত সেই শব্দার্থ তালিকাটি দেখলে কিছুটা বোঝা যায় কোন্ ধরনের মানসিকতার সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয় তঁার কবিতায়। বোঝা যায়, সর্বজনবোধ্য সারল্যের চর্চা কেন আদৌ সম্ভবই নয় তাঁর পক্ষে। আমরা কয়েকটি শব্দ, বাক্যবন্ধ ও তাদের কবিপ্রদত্ত ব্যাখ্যা দেখব। আরশি নগর---দুই ভুর মধ্যবর্তী একটি স্থান যেখানে কোনো সহজিয়া সম্প্রদায়ের মতে পড়শি বা মনের মানুষের বাস।

খণ্ডবিয়নী---দিব্য হাতপাখা। সমস্ত বিঘ্ন খণ্ডন করে। এই পাখার বাতাসে দু মাসের মড়াও বেঁচে ওঠে। মনসা বেহুলাকে এই পাখা দিয়েছিলেন। সংস্কৃত ব্যজন থেকে বাংলায় বিয়নী।

গ্রিমের সূত্র--ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনগুলি (প্, ত্, ক্ ইত্যাদি) জার্মানিক বা টিউটনিক শাখায় (অন্তর্গত) একটি নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছিলো। এই ধবনি পরিবর্তনে নিয়ম য়াকোব গ্রিম (jskob Grimm) সর্বপ্রথমে সূত্রাকারে প্রদর্শন করেন।

দুল্লা - আংটি। হিন্দী।

ৎসু - খড্গ, ছোয়া ইত্যাদির হাতল; খণ্ড-ত মুঠ।

ধুরা - রথের অক্ষ; চাকার মধ্যের দণ্ড।

পিসপাস - ভাতে-মাংসে একত্র পাক করা খাদ্য। ডাচ্ শব্দ।

প্রেস্টো চেঞ্জো - তুক অন্য প নে। জাদুসূত্র বা জাদুকরের নির্দেশসূচক বাক্য। Presto chango অনেকটা আমাদের ফুসমন্তর। ইংরেজী থেকে গৃহীত। ইতালীয় ত্নব্জন্দ্বব্দব্ধপ্স (দ্রুত) থেকে ০ নিয়ে ইংরেজী ন্তড্রুন্ধন্দ্ব গ্গু ট্রন্স্রুন্ধপ্স.

ফরীশী -- প্রাচীন ইহুদিজাতির অন্তর্ভূত আচারনিষ্ঠ ধর্ম ধবজী সম্প্রদায় বিশেষ।

ফাতরা -- কলাপাতার সঙ্গে যুত্ত শুকনো খোলা। পত্র থেকে ফাতরা। ময়মনসিংহ প্রাদেশিক।

ভশ্রী -- 'ভ'-এর মতো লিখিত শ্রী। জমিদারী সেরেস্তার টানা লেখায় শ্রী 'ভ'-এর মতো দেখায়।

মাংস -- আমাকে (মাং) সে (সঃ) পূর্বজন্মে খেয়েছে অতএব আমি তাকে খাবো---ব্যাসের মহাভারতের 'মাংস' শব্দের এই তাৎপর্য দেওয়া হয়েছে।

রমেন্দ্রকুমার আরো কিছু শব্দের অর্থ তালিকা দিয়েছেন কিন্তু তিনি মানে বলে দেননি এমন আরো বহু শব্দের নির্দেশিকা তঁার কবিতার জন্য জরি হতে পারে পাঠকের কাছে।

রবীন্দ্রনাথ যেহেতু উনিশ শতকের শেষ দুই দশক এবং বিশ শতকের প্রথম তিন দশক জুড়ে বাংলা কবিতার প্রধান কবি-ব্যত্তিত্ব ছিলেন--তাঁর শব্দভাবনাই বাংলা কবিতার শব্দভাণ্ডারের প্রধান নিয়ামক ছিল। লোকরসের কবিতা আর অলোক-রসের কবিতা--যার মধ্যে ভত্তি, প্রেম, আনন্দ, মুগ্ধতা, সৌন্দর্যভাবনার উদ্ভাসন থাকবে--এই দুইয়ের মধ্যে খুব স্পষ্ট ভাগ থাকা ভালো বলে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। লোকরসের কবিতায় নানাবিধ প্রাত্যহিক ব্যবহারযোগ্য শব্দের স্থান থাকলেও 'নৈবেদ্য' বা 'শেষ সপ্তক'-এর কবিতায় সে জাতীয় শব্দকে প্রবেশাধিকার দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন তিনি। কবিতায় বিদেশী শব্দের প্রয়োগও বিশেষ ভালোবাসতেন না। অভিধানিক শব্দ---অর্থাৎ অপ্রচলিত দুহ শব্দ, অপরিচিত অনুষঙ্গবাচক শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কেও ছিলেন নিৎসাহ।

আধুনিক বাঙালি কবিরা একেবারে প্রথম থেকেই বর্জন করেছিলেন এই মনোভাব। ফরাসি সিম্বলিস্ট ও ইংরেজী ইমেজিস্ট কবিদের শব্দভাবনা অনুসারে প্রয়োজনে যে কোনো শব্দ কবিতায় ব্যবহার করবার নীতিই গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ---কেবল পুরোনো বাংলা কবিতার 'কাব্যিক' শব্দাবলী বাদে। দুহ অপরিচিতের ভয় ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এলিয়ট আর পাউণ্ড। আগেই বলেছি--বৈদগ্দ্য-নিষণাত ও দুহ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা সাধারণভাবে চারের ও পাঁচের দশকের কবিদের ছিল না। কিন্তু নীতিগত ভাবে যে কোনো শব্দ প্রয়োগের স্বাধীনতা তাঁরা স্বীকার করতেন। রমেন্দ্রকুমারও কবিতায় প্রয়োগ করেছেন সর্বজাতীয় শব্দ--আক্ষরিক অর্থেই। বস্তুত তাঁর সমগ্র কবিতাবলীই সেই বিচিত্রতার উদাহরণ। তবু আমরা শব্দ প্রয়োগে বৈচিত্র্যের কিছু নিদর্শন উদ্ধার করছি।

প্রথম কবিতা-সংকলন 'আরশি নগর' থেকে---

১। আজ আমি হেনরি ফোর্ড, কিংবা এক রকফেলার এ-মেয়ের শান্ত সততায়, (বৃষ্টির পর রোদ)

বৃষ্টির পর রোদ। নিসর্গের সর্ব অঙ্গে বৃষ্টি ধোয়া রোদের সোনার টুকরো গাঁথা। এই 'রোদের সোনা'-র সমৃদ্ধিতে ধনী হয়ে উঠছেন কবি। বিত্তবানের প্রতিতুলনা 'হেনরি ফোর্ড' আর 'রকফেলার' -- বিশ্বের অন্যতম দুই প্রবাদ-প্রতিমা ধনকুবের। তেমন কোনো দুহতা নেই অর্থের উদ্ধারে, তেমন কোনো বত্রতা বা সূক্ষ্মতা আছে---তা-ও নয়। সহজ শব্দ বিন্যাস। কেবল পাঠকের জানা থাকা চাই ঐ দুই মার্কিনি ধনকুবেরের নাম। আধুনিক কবিতার পাঠক এটুকু জেনেই থাকেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই প্রথম কবিতা-গ্রন্থের শব্দ-চয়ন ও শব্দ বিন্যাস মোটের উপর সরল ও প্রত্যক্ষ।

২। ত্রোচে কি অতুল গুপ্ত কিছুই আমার নেই জানা।
ভালোবাসি সাজতে-গুজতে, হাতে কিছু ফুলের শায়ক,
ডি. ফিল. (অক্সন) তুমি, চেনো না চম্পক!

[ডি. ফিল. (অক্সন) তুমি]

ইংলণ্ডীয় বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের ধরনটিকে কটাক্ষ পরিহাসে মৃদুভাবে বিদ্ধ করেছেন কবি। যে ডি. ফিল. (অক্সন) চাঁপাফুল চেনে না তার পাণ্ডিত্যের অসারতা দেখিয়ে দেবার মধ্যে কবির নিজস্ব মননশীলতার ও

সৌন্দর্যচিন্তার ধারণাটি ফুটে ওঠে। এই ভাবনা তনয়ে রবীন্দ্রনাথও কবিতা লিখেছেন একাধিক কিন্তু ডি. ফিল. (অক্সন) এই শব্দবন্ধের প্রয়োগ একেবারে শেষ পর্বেও তাঁর লেখায় খুব প্রত্যাশিত ছিল না।

বিশিষ্ট ব্যক্তিনামকে কবিতায় ব্যবহার করবার রীতি আধুনিক কবিতায় পেয়েছি। যদিও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাচীন ইতিহাস, পুরাণ মহাকাব্য থেকেই উঠে আসত ব্যক্তিনাম---যেসব নামের সঙ্গে বাঙালি সর্ব-সাধারণের আজন্ম পরিচয়। কিন্তু জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে-র কবিতার ব্যক্তিনাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমকালীন প্রেক্ষাপটকে বিম্বিত করেছে। শিক্ষিত এবং সমাজ ও রাজনীতি মনস্ক পাঠকই কেবল নয়-- বলা যেতে পারে বিশেষভাবে 'এলিট' ক্লাসের পাঠকই তাঁদের উদ্দিষ্ট। বিশেষভাবে 'এলিটিস্ট' এটা এই কবিদের দোষ বা গুণ--যা-ই হোক---এটা যে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে-র কবিতা কোনো ভ্রান্ত উক্তি--তা বলা যাবে না। রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী কবিতায় ভাষাতেও এই এলিটিস্ট চরিত্র আছে পুরোমাত্রায়। পণ্ডিত অধ্যাপকের পঠনবৃত্তের পরিচয় দেবার জন্য তিনি ইতালীয় নন্দনতত্ত্ববিদ্ ক্রোচে ও বাংলায় 'কাব্যজ্ঞিাসা'-র লেখক অতুলচন্দ্র গুপ্তের নাম করেছেন। মুষ্টিমেয় সু-সংস্কৃত ব্যতীত অন্য পাঠকদের পক্ষে এই কাব্য ভাষার অর্থ উদ্ধার করা অসম্ভব। অর্থ না বুঝে এধরণের শব্দ প্রয়োগ পছন্দ করাও কঠিন। এজন্য কবির সমালোচনা প্রাপ্য নয়। মননী ও বিদগ্ধ চিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী তিনি--প্রথমেই বলে নিয়েছি সে-কথা। কিন্তু ঠিক এই কারণেই তাঁর পাঠক-সংখ্যা হবে সীমাবদ্ধ। এ-ব্যাপারে অভিযোগ আছে বলে মনে হয় না। তিনি তাঁর কবিতা সংকলন 'ব্রহ্ম ও পুঁতির মউরি' (এই নামের পৃথক গ্রন্থ আছে, কিন্তু ১৯৮৫-তে প্রকাশিত তাঁর চারটি গ্রন্থের সংকলনটিও এই নামেই আখ্যাত। আমরা সংকলনটির কথা বলছি)। সংকলনের ভূমিকায় কবিতার সৃষ্টি ও নির্মাণ, যুক্তি ও জাদু, বাচ্যার্থ ও ব্যঞ্জনা; কবিতার জৈবতা, রহস্য, অবচেতন, দর্শন-আধার হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া--এই সব কিছু নিয়ে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করেছেন কিন্তু কবিতার পাঠক-সংখ্যার কম বেশি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। এনিয়ে তাঁকে ভাবিত বলেও মনে হয় না। এজন্যই রমেন্দরকুমার বরেণ্য কবি কিন্তু নির্বাচিত কিছু পাঠকের কবি---তাঁর কাব্যভাষা সেই সত্যকেই তুলে ধরে।

প্রথম কবিতা-গ্রন্থ 'আরশি নগর' মোটের উপর সুবোধ্য ও সহজব্যক্ত ভাষাতেই রচিত। অর্থাৎ শব্দগুলি শিক্ষিত, সংস্কৃতিমানের জগৎ থেকে নেওয়া হলেও সেগুলির প্রয়োগে এবং অভিপ্রায়ে তেমন রহস্যময়তা নেই। আমরা আরো কয়েকটি উদাহরণ দেখতে পারি।

৩। নিপুণিকা, এমনি কি যাবে দিন ইয়ো ইয়ো খেলে? (সুন্দরী)

সুন্দরীর দিনযাপনের বিলাসময় লঘুতার চিত্রকল্প 'ইয়ো ইয়ো' খেলা। ভারতীয় খেলনা নয়। পশ্চিমের আমদানি, সুতোয় বাঁধা এক চকচকে চাকতি----আঙুলের নাচনে ওঠে নামে। তবু সরল কবিতা--যদি আধুনিক কাব্যভাষার নতুন প্রকাশভঙ্গিতে পাঠক ব্যাহত না হন।

তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, অচলিত এবং অত্যন্ত চলিত---সব ধরনের শব্দ প্রয়োগের কুশলতা দেখা যায় রমেন্দ্রকুমারের কবিতায়। কোনো ধরনেই তাঁর অনীহা নেই তবে তাঁর ভাষার চলনটি কিছু মন্থর, কিছু গম্ভীর। তৎসম চলনটার সঙ্গেই যেন তাঁর মনের মিল। অ-ত্বর অভিজাত্যের প্রতি কোনো টান থেকেই হয়তো।

৪। লক্কড়ের কারবারে যুদ্ধে জোর মুনাফা লুটেছি,
(আয়কর ! অতএব) সন্তর্পণে জানাই তোমারে
(একজন - রাজা)

এখানে 'লক্কড়', 'মুনাফা', 'লুটেছি' ইত্যাদি খুবই অ-মার্জিত ধরনের শব্দ ও ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সত্ত্বেও মিশ্রকলাবৃত্ত দীর্ঘ পয়ারে, চারটি চতুষ্পদীতে সাজিয়ে দেওয়া কবিতাটির ভাষা-বিন্যাসের ধরনটিতেই আছে এক তৎসম ধ্রুপদী-ত্ব। শেষ স্তবকটি উদ্ধার করা যাক ---

সুখাদ্যে আমার চি---একথোকা মাংসল আঙুর।/ মাত্রা রেখে নারীবৃন্দ, হুইস্কিও করতে হয় পান; / লোকে বলে অপূর্ব ময়ুর নাকি ভাসে সন্ধ্যাকাশে, / বিপুল কুস্তিগির যার কোনো রাখেনা সন্ধান।

যে কবিতায় 'লক্কড়', 'জোর মুনাফা লুটেছি' ব্যবহৃত হয়েছে সেই কবিতাতেই অন্তিম স্তবকের ভাষা-গঠনে সাধু বাংলার চাল লক্ষণীয়। ক্রিয়াপদের চলিত প থাকলেই এই চালের গাম্ভীর্য ও সাধুত্ব পাল্টায় না।

'আরশি নগর' থেকে আর দুটি মাত্র শব্দের উল্লেখ করব রমেন্দ্রকুমারের শব্দ ব্যবহারের ব্যাপ্তি ও যথার্থ্যের স্ফূর্ততা বুঝে

নেবার জন্য।
৫। উদ্দাম হাওয়াতে,
ভ্রু উদ্ধত, যৌবন-নতুনী, (ছায়া)
একসময়ে অমিয় চক্রবর্তী দীর্ঘ-ঈ-কারান্ত বিশেষণ নির্মাণ করে পাঠককে চকিত করেছিলেন। 'যৌবনী', 'চন্দনী' মনে পড়ে। 'যৌবনী জনতা' লিখেছিলেন তিনি তণ তণীদের মেলা বোঝাবার জন্য। 'জনতা'-র বিশেষণ পে 'যৌবনা' বা 'যুবতী' চলত ন া একেবারেই। 'যৌবনময়' অর্থে 'যৌবনী' ছিল যথার্থ। কিন্তু রমেন্দ্রকুমারের 'যৌবন নতুনী' অমিয় চক্রবর্তীর প্রয়োগবিধির অনুসরণ নয়। হয়তো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-এর রাধার বর্ণনার ' পোটলী বান্ধিয়া রাখ নহুলী যৌবন'-এর কিছু অনুসরণ আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যটির উল্লেখ আছে তাঁর অন্য কবিতায়। অমিয় চক্রবর্তী-র 'যৌবনী'-তে তণ ও তণী---দুইই সূচিত। রমেন্দ্রকুমারের 'যৌবন নতুনী'-তে যৌবনের অধিকারীকে নারীপে উদ্ভাসন দান করা হয়েছে।
৬। যেমন মোতিম হাঁস ফেরে তার আরত্ত সন্ধ্যায়, (স্বাতী)
'মোতিম' ব্রজবুলিতে ব্যবহৃত; 'মোতি' বা 'মুত্তা নির্মিত' বোঝায়। রবীন্দ্রনাথের 'মোতিম হারে বেশ বনা দে' স্মরণীয়। এখ ানে 'মোতিম' অর্থে 'মুত্তা আভাখচিত'----সন্ধ্যার আলোয় দেখা হংসশরীরকে অপূর্ব প দিয়েছে। বৈষ্ণব কবিতার সংস্কারে শব্দটিতে কেবল কমনীয়তাই নয়, এসেছে প্রেমেরও কোমল রত্তিম দ্যুতি।
৭। তারও পর আছে তার হিমধামা---নীলের উজ্জ্বল (হিমধামা)
ভূমিকায় কবি নিজেই লিখেছেন--- ''বিমূর্ত অনুভব'' শব্দটিকে স্থানচ্যুত করে বিদ্যাপতির 'হিমধামা-র অর্থ চাঁদ--শীতল কিরণ যার। কেবলই বিমূর্ত থেকে মূর্ত নয়--বিশেষ অনুভূতি বিশিষ্ট মূর্ততা পেয়েছে শব্দটি ---যা অন্য শব্দে আসে না--- 'অনুভব' শব্দে তো আসেই না।
প্রবন্ধের শুতেই এই কবির শিল্পীমানসকে আমরা মনন--নির্ভর ইন্দ্রিয়-সংবেদী বলে অভিহিত করেছিলাম। 'মোতিম', 'হিমধ ামা' এবং এরকম আরো অনেক শব্দ ত্রমে আরো বেশি করে এই প্রবণতাকে পরিচিত করেছে।
'আরশি নগর'-এর (১৯৬১) পর রমেন্দ্রকুমারের দ্বিতীয় কবিতা সংকলন 'অলংকৃত তীর'-এ (১৯৭৩) তৎসম শব্দের প্রয়োগ হয়ে উঠেছে আরো সুচিন্তিত ও বাঙময়। এখানে আমরা কবিকে সন্ধি ও সমাজবদ্ধ তৎসম শব্দ ও কিছু কিছু নিজস্ব শব্দ--যুগ্ম প্রয়োগ করতে দেখি। 'জ্যোতিন্মীলন', 'বালার্ক', 'ব্যাসকূট', 'মন্ত্রজীবিত'---ইত্যাদি শব্দের চেয়েও আমাদের বেশি আকর্ষণ করে 'কুবের সন্ধ্যায়', 'আনন্দওষধি', 'ঔধর্বদৈহিক', 'আজানুলম্বিতচুল' ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ এবং 'চক্ষুঃশ্রব া' শব্দের চয়ন।
যদিও রমেন্দ্রকুমারের শব্দভাণ্ডার সব ধরনের শব্দের জন্যই উন্মুত্ত, তবু তিনি বহু বিষয় অধ্যয়ন করলেও, বিশেষভাবে মগ্ন হয়েছেন ভারতীয় পুরাণ, শাস্ত্র, ধর্ম ও দর্শনের অভ্যন্তরে। বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বাউল-সাধনার প্রতিও তাঁর আগ্রহ। ১৯৮৩ তে প্রকাশিত 'ব্রক্ষ ও পুঁতির মউরি' সংকলনের শব্দ-প্রয়োগে ত্রমেই সেই কারণে প্রতীকী লক্ষণ ফুটে উঠতে থাকে। সে প্রতীকের সঙ্গে কিন্তু মালার্মে-র শুদ্ধ শাব্দ প্রতীকতার সাদৃশ্য নেই। ভারতীয় সাধন-চর্যার গুহ্য-প্রতীক ব্যবহারের ধরনটিকেই যেন অনুভব করা যায়।
রমেন্দ্রকুমারের সর্বশেষ কবিতা গ্রন্থ 'পুরোহিত দর্পণ' এর প্রকাশকালও সম্ভবত ১৯৮৩ অথবা ১৯৮৫ (সংকলনের অন্তর্ভুত্ত গ্রন্থটির ভূমিকা থেকে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না)। ---প্রায় সমকালীন শেষ দুটি সংকলনের কবিতার---শব্দ প্রয়ে াগের ধরনও একই রকম। এই গ্রন্থেই কবিতার শব্দে তাদের প্রতীকী রহস্যেকে পুরোপুরি বার করে এনেছেন কবি। স াধনতত্ত্বের প্রতীকের রহস্য সাধারণ বুদ্ধি ও বিদ্যার দ্বারা সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয় না। বিশেষ গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট দীক্ষা দ্বারাই ত া অনুধাবন করা সম্ভব। কবিতার শব্দ সর্বতোভাবেই গুহ্য সাধনার প্রতীক শব্দ দ্বারা রচিত না হলেও কবি কোথাও প্রতীক ার্থ উন্মোচনে সত্রিয় হননি। তার রহস্যটি যতটা সম্ভব থাকতে দিয়েছেন কবিতায়। শেষ দুটি কবিতা গ্রন্থের ভাষা তাই প্রথম দুটির চেয়ে দুহতর।
'ব্রক্ষ ও পুঁতির মউরি' থেকে কিছু উদাহরণ ---
৮। প্রেমিক তণ গান বাঁধে;
পুঁতির মউরি চুর হলে

কী নিয়ে বাঁচাবো?

.....

আসল পাখিটি পর্দায়

ঠিক ঢাকা পড়ে; লাস্য করে না। (পুঁতির মউরি)

পাখি প্রতীক ঘিরে কবিতা। তার একটি প পুঁতির ময়ুরি তে। কৃত্রিম সজ্জায় মোহনীয় প। সেই বাহির সাজে মুগ্ধ থাকে ম ানুষ, ভাবে এই প ভেসে গেলে সে বাঁচবে না। কিন্তু পুঁতির ময়ুরি-র প আবরণ মাত্র। 'আসল পাখি' টি কোথায়? সে ও কি ঐ পুঁতির-র পাখিতেই আছে? অথবা পুঁতির পাখি ঢেকে রেখে তবেই তাকে হৃদয়ে নিতে হয়। তখন সে শান্ত হয়ে হ ৃদয় পদ্মে বাসা বাঁধে --- 'লাস্য করে না'। অথবা সমস্ত মানেটাই কি অন্যরকম কিছু? 'পাখি', 'পর্দা', 'ঢাকা', 'লাস্য' -- শব্দগুলি যেন ধরা পড়ে না পুরোপুরি। খোলা রেখে যায় বহুল সম্ভাবনার দরজা।

৯। ডোমনীকে চত্রে নিয়ে রাজরাজ বসুন মশানে,

(চৌষট্টি পাপড়ির পদ্ম)

ডোমনী ও চত্র গুহ্য তান্ত্রিক সাধনার পরিভাষা ও প্রত্রিয়া বিবৃত করেছে।

অন্যান্য কবিতায় বল্মীক, উই, ৎসু, দিব্য সহস্র ছটায় জ্বলন্ত বেরাল----সবই বিভিন্ন ধরনের অনুভূতির প্রতীক হয়েছে। এই দুই সংকলনে কবির ভাষা প্রায়ই পাঠকের কাছে অচিন্তিত পূর্ব বিস্ময় নিয়ে আসে। যেমন একটি কবিতা 'ল'। বর্ণমালা দীর্ঘকাল ধরে অ-ব্যবহৃত বর্ণ ৯। তাকে নির্দিষ্ট প্রয়োগে সীমাবদ্ধ করা যায়নি বলেই সে যেন অস্তিত্বের সব ব্যাখ্যাহীন রহস্যোপলব্ধির সাংকেতিক লিপি

১০। তুই তো আসিছ,

ধূম্রময়ী ৯-এর কুণ্ডলী,

কেন ঘুমিয়ে আছিস? মূলাধার কুড়ে

মহাপরাত্রমে জেগে উঠে

আমাকে নাড়িয়ে দে। এই জাড্য

দূর করে দে।--(লি)

এইসব কবিতার আর কোনো স্পষ্টতর ব্যাখ্যা হয় না। সেই অর্থে বিশুদ্ধ কবিতা বলতে হয়তো এজাতীয় কবিতাকেই বোঝ ায়।

কিন্তু এমন কোনো সিদ্ধান্তে যাওয়া ঠিক হবে না যে---দেশ কালের সংযোগ থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয়ে কবিতা লিখেছেন রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী। তেমন কবিতা লেখা সম্ভব নয় কারোর পক্ষেই। যদিও সমাজ-মনস্কতার প্রবণতা তাঁর কবিত ার মৌল গড়নকে ছাপিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় না। কিন্তু যখন দেশকাল চেতনার সূত্র তিনি লগ্ন করে দেন কবিতায়, তখন তারও ভাষা---সর্বত্র না হোক, কখনো কখনো অভিনব।

১১। আমি যাবো সাত শূন্য শূন্য শূন্য চার শূন্য থেকে

ঘড়িহীন ছয় শূন্য পূর্ণের শহরে। (পিন ছয় শূন্য)

নাগরিকতার গ্রাস থেকে পরম উপলব্ধির দিকে যাবে মানবহৃদয় । কলকাতার পিন কোড দিয়ে নাগরিকতা বুঝিয়ে দেন কবি। দ্বিতীয় পঙক্তির 'শূন্য' যেন ব্রহ্মস্বাদী পূর্ণতার প্রতীকী শূন্য। অথবা অনন্ত বিনাশ! রমেন্দ্রকুমারের ভাষা স্বাতন্ত্র্য এখ ানে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে।

তবে একথা স্বীকার্য যে সমাজ চেতনার উপলব্ধির ভাষাকে তিনি রহস্যচেতনার উপলব্ধির ভাষার মতো অনুপম করে তুলতে পারেন না। বিশেষত সমাজবোধকে যদি সমকালীন রাজনীতির ভাষায় প্রকাশ করতে চান তাহলে তাঁর অভ্যস্ত রহস্য দ্যুতি তাঁকে ছেড়ে যায়। উদাহরণ ---

১২। শোনো, আসছে যোরোপ থেকে কামান ও প্লেন,

পশ্চিম গোলার্ধ থেকে কামান ও প্লেন,

বাজুকা, ভীষণ অস্ত্র, তৎক্ষণাৎ বর্মবিদারী,

ট্যাঙ্ক, জাগুয়ার জেট, ডেস্ট্রয়ার; সমুত্তাল কাগজমুদ্রায়
(তেল)

এই ভাষা যে কোনো মধ্যমমানের কবির পক্ষে অনায়াসে লিখে ফেলা সম্ভব। তবে অধিকাংশ কবিতাকেই তিনি সমাজের কথাকে এর চেয়ে ব্যঞ্জনাময় ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছেন।

গ্রামদেশের অভিজ্ঞতাকে আলাদা ভাবে কবিতায় বিশেষ গুত্ব দিতে দেখা যায়না তাঁকে। কিন্তু চলতি বাগ্‌ভঙ্গি মাঝে ম াঝে চমৎকার বসিয়ে দেন তিনি যেমন ---

'উনুন ভেঙেছি লাথি কেরে তবু অভদ্রা গেলো না',
(শ্যাম খ্রীষ্টান)

'সে আর জীবনে কোথাও বাঁধে না জোড়' (ত্রৌ ফেজন্ট)

'কার কাছে খাপ খুলছিস?
(অম্নিবাস)

আর বাঙালির লোকাচারের সঙ্গে অনুপুঙ্খ পরিচয় তাঁর কবিতার ভাষায় ছবি আঁকে। তবু রমেন্দ্রকুমার মননী অধ্যয়ন থেকে কাব্য ভুবনের ভাষা-আধারটি গড়ে নেন। তার পরিচয় গাঢ়তর হয়েছে সাম্প্রতিক দুটি সংকলনেই। ভালোলাগার মাত্রা গড়ে দেবার জন্য এসেছে নর্তকী ইসাডোরা ডানকান ও ভাস্কর রামকিঙ্করের নাম (ফর্ক); 'নগর থেকে গোঘ্ন' কবিত ায় প্রাচীন ভারতের লুপ্ত এক অতিথি সৎকার বিধির আধার ব্যবহার করে মানুষের আত্মিক সংকটকে তুলে ধরেছেন। 'ঘড়ি ঘুরে যায়' কবিতায় 'দুর্বল গোড়ালি' বাক্যবন্ধে অ্যাকিলিস-এর কাহিনীর অনুষঙ্গ। 'পুরোহিত দর্পণ ও পোড়াজল' সংকলনে 'নিরঞ্জনের স্মা' ধর্মমঙ্গল কাব্যের পাঠ ব্যতীত বোঝা যাবে না। 'পুরোহিত দর্পন' কবিতা ঠিকমতো বুঝতে গেলে প্রকৃতই পুরোহিত দর্পণ পড়া থাকা চাই।

এই শেষ কবিতা সংকলনটিতে রমেন্দ্রকুমার সময়ের বিষে আত্রান্ত ও জারিত হয়েছেন প্রবলভাবে। এই সংকলনে তাঁর সময়চেতনা, মানবসভ্যতার পদর্শনে তাঁর নৈরাশ্য ও ত্রোধ প্রকাশের জন্য তাঁর নিজস্ব ভাষা-আধারই ব্যবহার করতে পেরেছেন তিনি। দুহ শব্দ, নতুন ধরনের শব্দ বিন্যাস ও চিত্রকল্পের সাহায্যে তিনি এই আঁধার যুগকে প্রকাশ করেছেন তার দু একটি উদাহরণ এখানে দেখব ---

১৩। কামার বানায় ছোরা।
কামার কি জানে
কত রক্ত খাবে এটা?
সে তখন সৎ,
চিত্রী বা কবিরই মতো;
.....
বজ্রের লোহাকে পিটে-পিটে
সাকার বানায়, প্লেটোর খাটের মতো, নিরাকারে।
(কামার)

দেশজুড়ে হিংসার ব্যাপ্তি -- একথাই বলেন কবি। কিন্তু 'প্লেটোর খাটের মতো' বাক্যাংশের আশর্চ্য সংযোজন কামারের ছে ারা বানানোকে কোথায় নিয়ে যায় তা প্লেটোর আদর্শ এবং অনুকরণ-অসম্ভব, 'সুপ্রীম আইডিয়াল', কল্প-খাটের ধারণার সঙ্গে অপরিচিত পাঠককে বোঝানো অসম্ভব।

আরো প্রতিভার ক্ষরণ বিভান্বিত। একবিতা সুন্দর নয়। অ-সুন্দরের জীবন্ত শিল্প। মানব সভ্যতার চিরকালীন হত্যাপ্রবৃত্তির এক ক্লাসিক কবিতাপ। একটি শব্দও এ- কবিতায় সরিয়ে বসানো যায় না। আর এ ভাষার কাছে হার মানে সমালোচকের প্রয়াস। কবিতার শেষে 'আনন্দময়ী হয়ে মা/আমায় নিরান্দন কোরো না'---এক সর্বকালীন বিদ্রুপ কশাঘাত হয়ে আছড়ে পড়ে পাঠকের মনে।

এই সর্বশেষ সংকলনেই তদ্ভব ও দেশজ শব্দের প্রয়োগ জোরালো ও যথার্থ হয়ে উঠেছে। আমরা শেষ দৃষ্টান্তটি নিবেদন

করে শব্দশিল্পী রমেন্দ্রকুমারকে হয়তো অনেকটা চিনে নিতে পারবো। টানা গদ্যে লেখা কবিতা 'আমরি বাংলা ভাষা' --- ১৪। পরপর বোমা ফাটছে। রাজত্বের হিস্‌সা নিয়ে ওরা, নেচে নেচে, দুপক্ষই দূর থেকে খাণ্ডা ফরকাচ্ছে। ....চারজন শ্মশ্রুধারী যুবা (কবি নয়।) চৌখুপী তববন পরে, গায়ে চিটে গেঞ্জি কিংবা একটা লাল গামছা, বন্দুক পিস্তল হাতে, টর, ছুটতে ছুটতে (লেখক সর্বজ্ঞ। গবল্‌গনপুত্র সঞ্জয়ের মতো দিব্যচক্ষু --- আসলে চাক্ষুষ কেউ দেখে, দিব্যি গেলে পরে বলে গেছে রঙচঙে অনুপুঙ্খসুদ্ধ) .... শামানের ঢঙে তারা, যেন বিড়বিড় করে মন্ত্র বলছে
মার্ মার্ মার্ খান্‌কীর বাচচা।"এই পর্যন্ত লেখার পর কবি শব্দের প্রয়োগ নিয়ে নিজেই দ্বিধায় পড়ে যান যেন--- (প্রকৃত পক্ষে নয়, এ-ও লেখারই ধরন) --- কিন্তু বাগ্দেবী স্বয়ং তাঁকে বলেন "ভাষা আসনের মতো; কখনো ছোঁয়া যায় না। শুধু শব্দ বে-নিশানা হলে দোষ ঘটে। নইলে তার কত রূপ -- মরে যাই।"
রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর শব্দ-সন্ধান খুব কমই বে-নিশানা হয়।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com